
NEW STORY
রক্তবীজ
2
আবীর রায়
PART I

রক্তবীজ ২

–আবীর রায়

(পূর্বে লেখা যে দুটি গল্পের সুত্র ধরে এই গল্পটি এগিয়েছে তা হলঃ
'রক্তবীজ' এবং 'অভিশাপ')

প্রথম পর্ব ঃ

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে"

ছোপ ধরা দেওয়ালের গায়ে একটা আধভাঙ্গা টিনের বোর্ডের ওপর লেখা উক্তিটা। গা শিরশিরিয়ে উঠল ডরোথির। যতদূর চোখ যায়, ঢেউ খেলানো জমির ওপর গায়ে গায়ে দাঁড়ানো শুধু গাছ আর গাছ। নির্জন বনপ্রান্তরে যেন মন্ত্রবলে এই পুরোন হাসপাতালটা আবির্ভূত হয়েছে! তার গায়ে ঝোলানো রয়েছে বোর্ডটা। এখন কি রাত?না ভোর?না গোধূলি?আকাশ

অন্ধকার কিন্তু গাছের পাতায় পাতায় এই নিলচে আলো কিসের?আজ কি পূর্ণিমা? না, রাতের আকাশে যে ঘন মেঘ...
হঠাৎ দমকা হাওয়া উঠল। জঙ্গলের মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতাগুলো এলোমেলো ভাবে উড়তে লাগলো। তার সাথে ধুলো। এ কোথায় দাঁড়িয়ে ডরোথি?ধুধু বনের মধ্যে এই অন্ধকার আধ ভাঙা হাসপাতালের সামনে সে কি ভাবে এলো? সে তো এই জঙ্গলে এসে পড়তে চায়নি! সে কি খারাপ কিছুর টানে এখানে এসে পড়েছে? বুক হিম হয়ে গেল ডরোথির! তার গায়ের খাকি উর্দি ঘামে ভিজে সপসপে!
হঠাৎ হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে একটা শব্দ তার কানে এলো। শুকনো পাতার ওপর পায়ের শব্দ। কেউ তার পেছনে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। এক ঝটকায় ঘুরে গেল ডরোথি। যতদূর চোখ যায় শুধু ফাঁকা বন আর বন!
কেউ কি তাকে নিয়ে খেলছে? বেড়াল ইঁদুরকে মারার আগে যেমন খেলে... আবার শুকনো

পাতার ওপর পায়ের আওয়াজ। ঘুরে যায় ডরোথি! নেই নেই... শূন্য... শূন্য... এই পৈশাচিক মহারণ্যে সে একা।
ছুটতে শুরু করল ডরোথি। কিন্তু কোথায় যাবে? কতদূর যাবে? চিৎকার করে কাকেই বা ডাকবে? এখানে যে কেউ নেই! ...
না... কিন্তু কেউ আছে... তার অস্তিত্ব তের পেয়েছে ডরোথি। নাকে এসেছে তার নিঃশ্বাসের অশুভ আঁশটে গন্ধ। পড়ে থাকা একটা গাছের ডালে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ডরোথি।
মুখ তুলে বুঝল তার নাক ফেটে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। দূরে গাছের তলায় অন্ধকার ছায়ায় ঢাকা ওটা কে? কে ও? কে ওইভাবে সামনে দিকে ঝুঁকে একভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে? তার মুখ কেন দেখতে পাচ্ছেনা ডরোথি?
ওটা কি তাহলে...'সে'?
'সে' সেই একিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার ছায়ার ভেতর তার চোখদুটো যেন ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে। ককিয়ে উঠল ডরোথি! মাথায়

হাত দিয়ে বসে পড়ল! এ সব কি হচ্ছে! এই অমানবিক পৈশাচিক জঙ্গলে সে এলো কি ভাবে? আর অন্ধরারে ও কে যে তার দিকে কুটিল দৃষ্টি দিয়ে ওইভাবে দেখছে ?
অন্ধকার থেকে ছায়ামূর্তি এবার এগোতে থাকল তার দিকে। যেন হেঁটে নয়, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে প্রায় ভেসে ভেসে এগিয়ে আসছে 'সে'... একটি পুরুষের অবয়ব। কিন্তু তার মুখ... অন্ধকারে অদৃশ্য।
দম আটকে আসছে ডরোথির... তার যেন উঠে পালানোর ক্ষমতা নেই। আতঙ্কে তার পা দুটো আটকে গেছে মাটির সাথে...।হঠাৎ তার হাতে ঠেকল কোমরে ঝোলানো সার্ভিস রিভলভারটা। এক টানে সেটা বের করে আনল ডরোথি। তারপর হ্যামার টেনে অবয়ব এর বুক লক্ষ করে ট্রিগার টেনে দিল। পর পর দুবার।
দুটো কানফাটানো শব্দ তারপর সব চুপ!
ছায়ামূর্তির পেটের দুদিকে লেগেছে গুলি। সে কয়েক'পা ছিটকে পিছিয়ে গেল! বুলেটের ক্ষত দিয়ে চুঁইয়ে বেড়িয়ে এলো টাটকা রক্ত। ঝড়ে

পড়ল তা ভিজে মাটিতে...
অবয়ব সেই ভাবেই কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর।
ডরোথি নামিয়ে আনল রিভলভার। বুকের ধুকপুকানি যেন একটু স্বাভাবিক। তার গুলি পেটে লাগতেই-
হঠাৎ জমে গেল ডরোথির বুক! না না না! এমন ভুল সে কেন করল! ওই রক্তেই যে পাপের উৎপত্তি! সে তো রক্ত নয়, নরকের দ্বার!
বন্দুক ফেলে দৌড়ে গেল ডরোথি। হাওয়ায় উড়িয়ে নিচ্ছে ধুলো! মড় মড় করে উঠল আশেপাশের গাছগুলো... অপার্থিব দেহটির পাশেই মাটি ভিজে রয়েছে চাপ চাপ রক্তে! আর কোনও উপায় নেই...
দাঁতে দাঁত চেপে ডরোথি রক্তে ভেজা মাটির খাবলা তুলে নিলো। তারপর নিজের মুখে ঠেসে কিছু বুঝে ওঠার আগে গিলে ফেলল মাটির মণ্ডটা! মুখ বিকৃত হয়ে গেল ঘেন্নায়!
হঠাৎ একটা প্রচণ্ড হাওয়ার দমক! ডরোথির পেছনের শাল গাছটা গোড়া থেকে আলগা হয়ে

ঝুঁকে পড়ল তার ওপর-
ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ডরোথি বোস!
ঘাড় ছিঁড়ে যাচ্ছে টানের যন্ত্রণায়। বোধহয় গদির চেয়ারে ঘাড় এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ফল।
চোখটা খুলেই আশপাশটা দেখে নিল ডরোথি। নাহ, এটা তার রোজ দেখা ভবানিভবন এর অফিসঘর। মোটেও কোনও ঘুটঘুটে জঙ্গল বা এঁদো-পোড়ো হাসপাতালের সামনে নেই সে।
ঘণ্টা বাজিয়ে আর্দালিকে ডেকে চা দিতে বলল। ডরোথি আই-পি-এস বছর পাঁচেক আগে হয়েছে । কর্তব্যপরায়ণতার জন্য তার ডিপার্টমেন্টে সুনাম আছে। ...তেমনটা সে মনে করে। কিন্তু রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরের অলিন্দে কান পাতলেই শোনা যায় সহকর্মীদের মনে ডরোথি বোস সম্পর্কে কি ধারণা রয়েছে ... দুমুখো, নির্লজ্জ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, নিষ্ঠুর....!
নিজের পদোন্নতির স্বার্থে নিরীহ নির্দোষ মানুষকে নারকো-কেস দিয়ে ১২ বছর জেলে পচার জন্য ফেলে দেওয়ার মত জঘন্য কাজ করেও সে অম্লান বদনে মন্ত্রী-সান্ত্রীদের স্নেহের

পাত্রী হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। পুলিশ-মহলের কাছে এও এক বিস্ময় যে ডরোথি বোস যেই যেই জেলায় পুলিশ-সুপার হয়ে গেছে, কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে বিরোধী রাজনীতির কাজকর্ম অস্বাভাবিক রকম ভাবে থেমে গেছে। কোথাও রাতের অন্ধকারে বিরোধী দলের পার্টি অফিস ৫ জনকর্মীসহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কোথাও পুলিশ প্রচণ্ড স্বক্রিয় হয়ে একঝাঁকে এনকাউন্টার করে ফেলেছে এমন লোকজনকে যাদের জন্য লোকাল কোনও নেতার ছেলের মাছের ভেড়ি বন্ধের মুখে দাঁড়িয়েছিল। ডরোথিকে নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠতে থাকায় তাকে জেলা থেকে সরিয়ে গোয়েন্দা-বিভাগে বদলি করা হয়।

চা খেয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এসে জায়গায় বসতেই সেক্রেটারি খবর দিল ডিআইজি সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন। কুর্তির ওপর গলায় ওড়নাটা দিয়ে বেড়িয়ে গেল ডরোথি।

“এটা পড়ে দেখো।” হাসিখুশি বছর পঞ্চাশের ডিআইজি সাহেব ডরোথির দিকে একটা

কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন।
ডরোথি কাগজটা এক ঝলক দেখে ডিআইজি সাহেবকে ফেরত দিয়ে বলল, "তাড়াহুড়োয় চশমাটা ঘরে ফেলে এসেছি স্যার, ঝাপসা লাগছে, একটু যদি পড়ে দেন।"
"এই বয়সে চোখের এই অবস্থা করেছো..." এক গাল হেসে কাগজটা মেলে ডিআইজি পড়তে আরম্ভ করলেন।
"আমি অপরাধী। জেনে হোক, না জেনে হোক। সেই অপরাধের ভার এইভাবে দিনের পর দিন বয়ে নিয়ে চলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি জানি আমার চলে যাওয়াটা হয়ত কোনো সমাধান নয়, বা আমি চলে গেলে আমার জন্য সৃষ্টি হওয়া বিপত্তির কোন সুরাহা হবে না। কিন্তু আমি শান্তি পাবো। আইনের চোখে আমি অপরাধী হই বা না হই, আমার বেঁচে থাকার আর কোনও কারণ বা তাগিদ নেই। চোখের সামনে একে একে আমার প্রত্যেকটা প্রিয় মানুষকে শেষ হতে দেখছি। এই বিধ্বংসের ভাগীদার হয়ে আমার একাকিত্বকে আঁকড়ে

ধরে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। এটাই হয়ত আমার প্রায়শ্চিত্ত!
আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।
–শিবানী সেন”
কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে ডরোথি বলল, “সুইসাইড নোট?”
“হ্যাঁ।” ডিআইজি কাগজটা ভাঁজ করতে করতে বললেন। “গত ডিসেম্বরে এনার বডি পাওয়া যায় আসানসোলের একটা পুরনো ফ্ল্যাট থেকে। বেডরুমে, ঝুলন্ত অবস্থায়।”
“একাই থাকতেন?”
“একাই থাকতেন। তবে রহস্য এখানে নয়। রোজ কত লোকই তো সুইসাইড করে। রহস্য অন্য জায়গায়। এনার মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে এনার বৃদ্ধ মা-বাবা একসাথে খুন হন এই ফ্ল্যাটেই। মা লক্ষ্মী গুহরায় কে পাওয়া যায় পাশের গলিতে, পসিব্লি ঠেলে ফেলা হয়েছে জানলা দিয়ে। আর বাবা জীবনকিশোর গুহরায়ের ঘাড় মটকানো লাশ পাওয়া যায় বাথরুমে।”

ডরোথি খানিকক্ষণ ভেবে বলল, “তাহলে তো মিলেই যাচ্ছে। উনি তো নিজেই কনফেস করেছেন ওনার জন্যই সবাই মরেছে। লেখা শুনে মনে হচ্ছে উনি মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। হয়তো ডিপ্রেশন বা হ্যালুসিনেশন এ ভুগতেন... এ ধরনের মানুষের পক্ষে মার্ডার ইজ নো বিগ ডীল।”

“এ ক্ষেত্রে নয়।” মাথা নেড়ে বললেন ডিআইজি, “ভদ্রমহিলার বয়স ছিল ৫১ বছর। উনি পারকিন্সন্স এ ভুগতেন। মানে এমন নার্ভের রোগ যাতে দু হাত কম্পনের ফলে সাধারণ কাজগুলি করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। মা কে ঠেলে ফেলা গেলেও, বাবার ঘাড় মটকাতে যতটা হাতের জোর প্রয়োজন ওনার তা থাকা অসম্ভব। তুমি ঠিকই বলেছ, উনি হীনমন্যতায় ভুগতেন, প্রেশারের ওষুধ খেতেন। বিয়ের ৬ মাসের মধ্যে ওনার স্বামী মারা যায়, একা একা সন্তান মানুষ করা সম্ভব নয় ভেবে নিজের গর্ভের সন্তানকেও উনি নষ্ট করে দেন তার পর পরই। তারপর কয়েকদিন

রূপনারায়নপুরের একটি মেসে কাটিয়ে ফিরে আসেন বাবা-মার কাছে আসানসোলে। তারপর আর বিয়ে করেননি। কাজ-কর্মও তেমন করতেন না। টুকটাক টিউশনি, হাতের কাজ... ব্যাস। মারা যাওয়ার আগের উনি অনুসূয়া গুপ্ত নামক ওনার এক পুরনো বন্ধুকে একটি মেসেজ পাঠান, যেটার কারণে রহস্য আরও দানা বেঁধেছে।"

"কি মেসেজ স্যার?"

" "হি ইজ ব্যাক!" "

থমথমে নিস্তব্ধটা ঘরে। শুধু এসির আওয়াজ... আর দুজনেই চুপ।

"কে ফিরে এসেছে স্যার?" ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল ডরোথি।

ডিআইজির মুখে মুচকি হাসি, "সেটা জানাটাই তো তোমার কাজ ডরোথি। কার প্রত্যাবর্তনের ফলে সে নিজেকে শেষ করে দিল? কে এই তিনটি মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে দায়ী?"

ডরোথি খানিকক্ষণ ভেবে বলল, "এই অনুসূয়া

গুপ্ত ভদ্রমহিলাকে জেরা করা হয়েছে?”
“সম্ভব নয়।” বললেন ডিআইজি। “উনি গত বারো বছর দেশ ছাড়া। বর্তমানে স্বামির সাথে নরফোকএ থাকেন। ফোনে ধরা হলে উনি বলেন এই মেসেজটির কোনও ব্যাখ্যা তাঁর কাছেও নেই। হয়তো উনি মিথ্যে বলছেন বা সত্য গোপন করছেন কিন্তু উনি ব্রিটিশ সিটিজেন হওয়ার দরুন, এর বেশি ওনাকে প্রেশার দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই যা করতে হবে ওনাকে ভুলে গিয়েই করতে হবে।”
ডরোথির মাথায় হাজার অঙ্কের জাল বোনা চলছে। কিভাবে এগোবে এর সমাধানের পথে? কাকে রিমান্ডে নেবে? কোথায় গেলে একটু হলেও ক্লু মিলবে... হঠাৎ এক ঝলক আলো খেলে যায় মাথার মধ্যে...
“স্যার, শিবানীদেবীর কি কোনও আত্মীয় স্বজন নেই?”
“আছে, তবে না থাকার মতই। শুধু এক বৃদ্ধ মামা। নাম পীতাম্বর রায় চৌধুরী।”
“তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?”

"বীরভূমের মল্লারপুরে।"
***
ডরোথির গাড়ির চাকা যখন মল্লারপুরের মাটি স্পর্শ করল তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয় হয়। গ্রামে ঢোকার মুখে একটি উঁচু শ্বেতপাথরের তোরণের পাশে সাদা স্করপিওটা আলতো করে ব্রেক কষল। ধু ধু মাঠের মাঝখান দিয়ে কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। দূরে গ্রামের টিমটিমে আলো দেখা যাচ্ছে। ডরোথি মুখ বের করে দেখল; তোরণটার ওপর একটি বয়স্ক মানুষের আবক্ষ মূর্তি বসানো। শেষ বেলার নিভুনিভু আলো মুখের খাঁজগুলোতে পড়ে আলো আধারির সৃষ্টি করেছে। তলায় শ্যাওলা-ধরা মার্বেলের ফলকে খোদাই করে কিছু একটা লেখা... আধো অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছেনা। ডরোথি বলাতে ড্রাইভার হেডলাইট ওপরে করে পড়ে দিল।

"(ইশ্বর)৺গঙ্গাধর রায়চৌধুরী
১৮৭৭-১৯৫৭
মল্লারপুরের জনক ও পরিত্রাতা"

বাঁকা হাসি হাসল ডরোথি। আশপাশের ঝোপ-জঙ্গল থেকে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকতে আরম্ভ করেছে। নির্জন মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডরোথি আর তার ড্রাইভার। লোকাল থানা থেকে আসার কথা ছিল... আচ্ছা বেআক্কেলে তো! ডরোথি হাতঘড়িটা দেখল। ছটা দশ। যদি আর দশ মিনিটের মধ্যে তারা না আসে তাহলে ওসি কে কালকের মধ্যে বদলীর ব্যবস্থা করার কথা ভেবে ফেলল ডরোথি।
দূরে হঠাৎ একটা ছোট্ট আলোর বৃত্ত দেখা গেল। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ডরোথি। অন্ধকার চিরে শ্যামলা গোছের একটা লোক টর্চ হাতে এসে দাঁড়িয়ে স্যাল্যুট করল ডরোথিকে। গায়ের উর্দি দেখলে বোঝাই যায় সে হাবিলদার।
"তোমাকে পাঠিয়েছে আমায় রিসিভ করতে?" বিরক্তির সুরে জিজ্ঞেস করল ডরোথি।
"না ম্যাডাম, স্যার আসছিলেন, গাড়িটার অ্যাক্সেল ভেঙ্গে গেছে মাঝরাস্তায়। তাই আমায় এগিয়ে আসতে বললেন স্যার।"

লোকটিকে গাড়ির পেছনে তুলে নিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করল।
অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে টানা মেঠো রাস্তা। দুদিকে লম্বা ঘাসের ঝোপ। আলো বলতে শুধু গাড়ির হেডলাইট। গাড়িটা একটা ঢালের পাশ দিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিতেই ডানদিকে ঝোপের ধারে একটা জীপকে কেতরে পড়ে থাকতে দেখা গেল।
“রোককে রোককে ড্রাইভার সাহেব।”
হাবিলদারটি পেছনের দরজা খুলে নেমে গেল। ডরোথিও নামলো। জীপের নিচের দিকে দু’জন মেরামতির কাজে ব্যস্ত ছিল। স্করপিওটাকে থামতে দেখে দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে স্যাল্যুট করল। বোঝাই যায় একজন ড্রাইভার। অন্যজনের দিকে ডরোথির নজর হঠাৎ আটকে গেল। হাতের কনুই অব্দি গ্রিজ লাগা, ৬ ফুটের ওপর লম্বা, আর সন্ধের অন্ধকারেও ঝলমলে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। খাকি উর্দি মোড়া এমন সুপুরুষ মূর্তি ডরোথি এর আগে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না।

“ইন্সপেক্টর অমর মজুমদার ম্যাডাম।”
ডরোথি চোখ সরাল না। গলার স্বর ভরাট আর গমগমে।
“ওদিকে ড্রাইভার কামাল, আর হেড কনস্টেবল মৃত্যুঞ্জয় নস্কর। এছাড়াও এসআই ফিরোজ মণ্ডল আর দুজন সেপাই ষ্টেশনে রয়েছে ম্যাডাম।”
ডরোথি দেরি হওয়া নিয়ে কিছু বলতে গিয়েও পারল না।
“আপনি কি এখন ষ্টেশনে যাবেন না কোয়ার্টারে?” অমর জিজ্ঞেস করল।
“রাত হয়ে গেছে, এখন ষ্টেশনে গিয়ে কাজ নেই।”
ডরোথির থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল জনবহুল এলাকা থেকে একটু দূরে একটা বিচ্ছিন্ন পুরনো একতলা বাড়িতে। বাড়িটার সামনে অনেকটা জমি, একটা ছোট ডোবা, তাঁর পাশ দিয়ে সোজা ৫ মিনিট হেঁটে গেলেই থানার পেছনের গেট।
ডরোথির কেয়ারটেকার হিসেবে গ্রামেরই একটি

মেয়েকে রাখা হয়েছে যে তার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। ড্রাইভারটি থাকবে থানাতেই।

ডরোথিকে ঘরে ছেড়ে অমর আর মৃত্যুঞ্জয় থানার দিকে যাবে এমন সময় পেছন থেকে ডরোথি ডাকল, "অমর,"

"ম্যাডাম?"

"তুমি কি রাতে থানাতেই থাকো?"

"না ম্যাডাম, রাতে আমি এখানে থাকি না, আমি বাড়ি আছে গ্রামে, সেখানেই চলে যাই। সেপাইরা থাকে, মৃত্যুঞ্জয় থাকে, আপনার কোনও দরকার লাগলে-"

"ঠিক আছে তুমি এসো।"

যে মেয়েটিকে ডরোথির কেয়ারটেকার হিসেবে রাখা হয়েছে তার নাম 'শ্যামা'। গ্রামেরই মেয়ে, তবে রান্নার হাতটা চমৎকার। রাতে খাওয়ার সময় ডরোথি শ্যামাকে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁরে পীতাম্বর রায়চৌধুরী কে চিনিস?"

শ্যামা জবাব দিল, "হ্যাঁ, কর্তাবাবার নাতি তো।"

"কর্তাবাবা?"

"মল্লারপুরের সবাই চেনে। বহু বছর আগে মল্লারপুরে একবার মহামারি লাগে, তখন কর্তাবাবা আর তার ছেলে মেয়ে মিলে কোমর বেঁধে সবার সেবা শুশ্রূষা করে। তখনকার দিনে না ছিল ভাল বদ্যি, না কোনও হাসপাতাল। কলকাতা থেকে ডাক্তার এনে নিজের ঘরের টাকা জলের মত ঢেলে গ্রামের মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে তোলে। কিন্তু হাড়ভাঙা খাটুনির জন্যই হোক, বা রুগিদের সাথে দিনের পর দিন থাকার জন্যই হোক,কর্তাবাবার একমাত্র মেয়ে অজানা রোগে পড়ে কয়েকদিনের ভিতরেই চলে যায়। তারপর থেকে গ্রামের লোক কর্তাবাবাকে ভগবানের মত শ্রদ্ধা করত আর ভালবাসত। পরে সরকার থেকে ওনার মরা মেয়ের নামে গাঁয়ের পশ্চিমে একটা হাসপাতালও গড়ে দেয়। ওনার মৃত্যুর এত বছর পর ও মল্লারপুরের মানুষ ওনাকে ভোলেনি। এই দেখেন না, আমরা তো শুধু ওনার গল্প শুনেছি কিন্তু আমরাও ওনার নাম নিয়ে কথা বলিনা, বলি 'কর্তাবাবা'।"
ডরোথি রুটিতে মাংসের ঝোল লাগাতে লাগাতে

বলল, “আচ্ছা, এই কর্তাবাবাই তার মানে গঙ্গাধর রায়চৌধুরী? গ্রামে ঢোকার মুখে যার মূর্তি দেখলাম?”
“আজ্ঞে।”
“আর এই পীতাম্বর রায়চৌধুরী?”
“কর্তাবাবার বড় ছেলে পবন রায়চৌধুরীর ছেলে। কিন্তু তাঁকে দিয়ে কি হবে গো দিদি? তাঁরও যে অনেক বয়স। তার ওপর মাথায় ছিট। অত বড় জমিদার বাড়িতে বছরের পর বছর ভূতের মত একা একা পড়ে রয়েছে!”
ডরোথি হেসে বলল, “তাকে নিয়েই যে আমার কাজ রে শ্যামা।” তারপর থেমে বলল, “কাল একটু ভোর ভোর কাজে আসিস। বেলায় জমিদার বাড়িতে যাবো।”
***
মেঘে ঢাকা আকাশের নিচে যেই ফটকটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, বোঝাই যায় একসময় তার জৌলুস ছিল অতি উজ্জ্বল। কিন্তু আজ কালের গ্রাসে ক্ষতবিক্ষত যেই সিংহদুয়ারটার সামনে এসে ডরোথির গাড়ি দাঁড়াল, সেটিকে

রায়চৌধুরীদের অতীতের ঐতিহ্যের কংকাল বললে একটুও বেমানান হবে না। থামের গা বেয়ে গাছ গজিয়েছে, ইঁটগুলো একে অপরের সাথে মরিয়া হয়ে ঝুলে রয়েছে। মাথার ওপর শিরচ্ছেদ হওয়া মূর্তিটি এককালে একটি সিংহের ছিল।
আজ ভোর থেকে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। সূর্যের দর্শন একবারের জন্যও পাওয়া যায়নি। গাড়ি থেকে নেমে ডরোথি আর অমর মূল ফটক পেড়িয়ে চাতালে ঢুকল। হেড কনস্টেবল আর ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেল পুকুরের ধারে পার্কিং করবে বলে। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো ডরোথি। কি করুণ অবস্থা এত বিশাল একটা স্থাপত্যের! যেন কোথাও একটু হাত লাগলেই ধুলো হয়ে ঝরে পড়ে যাবে গোটা বাড়ি। একটা অন্ধকার প্যাসেজ পেড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল ডরোথি আর অমর। মাথার ওপর চিলেকোঠা কিন্তু তার চাল জায়গায় জায়গায় ভেঙ্গে গিয়ে দিনের আলো এসে পড়ছে সিঁড়ির ওপর। নয়ত গোটা বাড়িটাই এই

দিনের বেলাতেও কেমন অন্ধকার অন্ধকার। দোতলার করিডোরে উঠতেই ডরোথি আর অমর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একটা বিদঘুটে আঁশটে গন্ধ গোটা করিডোর জুড়ে। এখানে হাওয়াটাও কেমন যেন স্যাঁতস্যাঁতে। খানিকটা সমুদ্রের পাড়ে যেমন হয়। সামনে ডানদিকের দরজাটা খোলা। ওইটাই বোধহয় পীতাম্বরবাবুর ঘর। ঘরের চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়াল দুজন। আর প্রায় গা গুলিয়ে বমি এসে গেল... গন্ধটা এখানে বিকটভাবে কড়া!

ঘরের মাঝখানে একটা আরাম কেয়াদায় খালি গায়ে এক বৃদ্ধ আধ-বোজা চোখে বসে আছে। ঘর ভর্তি আবর্জনায়। কোথাও ডাঁই করে রাখা কাপড়ের স্তূপ, কোথাও ভাঙা ফার্নিচারের টুকরো, মেঝেতে নানা রকম বয়াম আর শিশি; তাদের কোনওটায় দুটো বিস্কুট, কোনওটায় একটু মুড়ি, কোনওটা খালি।

"পীতাম্বরবাবু," মলায়েম সুরে ডাকল ডরোথি।

"কে?" চোখ খুলল বৃদ্ধ। দেখেই বোঝা যায় বামদিকের চোখটা ছানি পড়ে প্রায় অকেজো।

ওপর চোখটাও কতটা কাজ করে বলা মুশকিল।
নাকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ঘরে ঢুকল ডরোথি আর অমর। ডরোথি তাকিয়ে দেখল ঘরের দেওয়াল জুড়ে প্রচুর দেব-দেবীর ছবি। সবই অত্যন্ত পুরনো, রং চটা, ফ্রেম ভাঙা... কিন্তু একটা ব্যাপার প্রায় প্রত্যেকটা ছবিতেই দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক দেব-দেবীর মুখের কাছটা যেন কালশিটে পড়ে গেছে। তলায় কুপি ধরলে যেমন ভুসোকালি পড়ে, ঠিক তেমন...
"কারা তোমরা?" গমগমে গলায় বৃদ্ধ প্রশ্ন করল।
ডরোথি একটু ভেবে গলা নামিয়ে বলল, "আমরা থানা থেকে আসছি। কয়েকটা বিষয় আপনার থেকে জানা দরকার। আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না।"
ডরোথি বা অমর কেউই উর্দি পড়ে ছিলনা বলেই বোধহয় বুড়ো একটু শান্ত হয়ে আবার গা এলিয়ে দিল।
"বলো কি জানতে চাও।"

ঘরের ভেতরটা আধো অন্ধকার। আলো যা আসছে সামনের দরজা দিয়ে। পূবদিকের দুটো জানলাই সেঁটে বন্ধ করা, এবং তা বহুদিন থেকে বন্ধ। তার সামনে রাখা আবর্জনার স্তূপ দেখলেই তা বোঝা যায়।

“আপনার ভাগ্নির ব্যাপারে আপনি খবর পেয়েছেন?” মার্জিত শব্দ চয়ন করল ডরোথি।

“পেয়েছি।”

“আর আপনার বোন আর ভগ্নীপতির-”

“তাদের খবরও আমায় জানানো হয়েছে।” আধবোজা চোখেই বৃদ্ধ উত্তর দিলেন।

ডরোথি আর অমর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এই বয়সে এত নির্লিপ্ত ব্যবহার হওয়াটা স্বাভাবিক হয়। এক যদি না বোনের পরিবারের সাথে ওনার সম্পর্ক চুকে গিয়ে থাকে।

“বুঝতেই পারছেন আপনার বোনের পরিবারের মৃত্যুগুলি স্বাভাবিক নয়। হয় আপনার ভাগ্নি বা তার গোটা পরিবার কোনও ডিলিউশন না প্যারানইয়ার শিকার ছিল। বা হয়ত তৃতীয় কেউ তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। এই বিষয়ে আপনি

কোনও আলোকপাত করতে পারবেন?"
বৃদ্ধ এবার চোখ মেলে তাকালেন। তার নজর ডরোথি থেকে অমর হয়ে আবার ডরোথিতে ফিরে এলো।
"বসো।"
দরজার পাশে দুখানা ভাঙা মোড়া ছিল। অমর সেই দুটো টেনে এনে একটায় ডরোথিকে বসতে দিল, একটায় নিজে বসল।
পীতাম্বর রায়চৌধুরী বলতে আরম্ভ করলেন, "আমার জন্মের বেশ কয়েক বছর আগে মল্লারপুরে এক অঘোর ভৈরবের আবির্ভাব হয়। এক অমাবস্যার রাতে সে গ্রামেরই একটি বাচ্চাকে বলি দিতে উদ্যত হয়। আমার পিতামহ, আমার বাবা, খুড়ামশায় আর গ্রামের প্রচুর মানুষজনকে নিয়ে বাচ্চাটিকে বলি দেওয়ার আগে উদ্ধার করে আর গ্রামবাসীরা অঘোরকে জ্যান্ত পিটিয়ে মারে। মরতে মরতে অঘোর আমার পিতামহকে অভিশাপ দেয় যে তার বংশে কেউ কোনোদিন সুখী হবে না। তার অভিশাপের কোপ আমার পিতামহের সবচেয়ে

কাছের মানুষগুলির ক্ষতি করবে। শয়তান মানুষ রূপে আমাদের বংশে জন্ম নেবে!
"এরপর জন্ম হয় আমার। আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন একদিন হঠাৎ আমার ব্যবহারে পরিবর্তন আসে। আমার পুরোপুরি মনে না থাকলেও, এইটুকু মনে আছে যে আমি ধূম জ্বরে পড়ি। তারপর কি হয় আমার মনে নেই, যা বলেছিলেন যে আমি নাকি দাদামশায়ের গলা টিপে ধরেছিলাম। এমন হিংস্র ব্যবহার করেছিলাম যা একটা ওই বয়সের শিশুর পক্ষে অসম্ভব! এরপর জন্ম হয় লক্ষ্মীর-"
"মানে শিবানীর মার?" ডরোথি জিজ্ঞেস করল।
"হ্যাঁ,শিবানীর মা, আমার খুড়তুতো বোন... তার মধ্যে এই হিংস্রতা আমার কয়েকগুণ বেশি ছিল। যেন সে একাধারে মানুষ, একাধারে রাক্ষসী! আমি চুপচাপ দেখতাম, কিন্তু কাউকে বলতে পারতাম না... ভয় পেতাম... আমার মধ্যেও যে এই অভিশাপ তার ডালপালা বিস্তার করছে! লক্ষ্মীর যখন মাত্র কয়েক মাস বয়স,

একদিন রাতে খুড়িমা আমায় ওর কাছে বসিয়ে ঘরের কাজ করছেন, দেখি তার খাটে শুয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। আমি কাছে যেতেই বুঝতে পারি সে আমার দিকে নয়, আমার পেছনে রাখা আয়নাটার দিকে তাকিয়ে হাসছে। কাকে দেখতে পেয়েছে সে আয়নার? আমি পেছনে তাকালাম, আয়নার দেখলাম নিজের প্রতিচ্ছবি... কিন্তু কিন্তু... আমার ঘাড়ে ও কে চেপে বসে আছে! বোঝার আগেই আয়নার মাঝখান দিয়ে চিড় খেয়ে খান খান হয়ে ভেঙ্গে ঝরে পড়ল ঘরের মেঝেয়... তাকিয়ে দেখি লক্ষ্মী প্রস্রাব করে ফেলেছে... কিন্তু মুখে তখনও সেই বুক হিম করা হাসি লেগে আছে তার। আজ এতবছর পর বলেই তোমাদের বলতে সাহস পাচ্ছি... সকলে জানে পৌষ কালী পুজার রাতে দাদামশাই ছাদ থেকে পা পিছলে পড়ে মারা গেছিলেন। সেই রাতে আমি চুপি চুপি ওনার পেছন পেছন ছাদে উঠেছিলাম। দেখি লক্ষ্মী বলি দেওয়া পাঁঠার মাথাটা থেকে টাটকা রক্ত চুষে চুষে খাচ্ছিল! দাদামশাই ওকে টেনে

ছাদ থেকে নামিয়ে আনতে চান... কিন্তু লক্ষ্মী এক লাফ দিয়ে পাঁচিলের ওপর উঠে পড়ে। দাদামশাই হন্তদন্ত হয়ে ওকে উদ্ধার করতে যান... লক্ষ্মী রক্তমাখা হাত দিয়ে ওনার গলা টিপে ধরে বলে, "সে আসছে!", তারপর এক ঝটকায় দাদামশায়ের অত বড় শরীরটাকে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ডিগবাজি খাইয়ে ফেলে। উনি গিয়ে সজোরে পড়েন নিচের শান বাঁধানো উঠোনে!"...



দ্বিতীয় পর্ব ঃ

কয়েক মিনিট ঘর থমথমে!
ডরোথি আর অমর শ্বাস বন্ধ করে পীতাম্বর রায়চৌধুরীর কথা শুনছিল।
অনেক্ষণ পর টেনে শ্বাস নিল।
ডরোথির হাতে ধরা ছোট্ট নোটবইতে সে লিখল,

"Recurring Paranoia across generations.Probability of Delusion, Hallucinations and Dissociative Identity Disorder which might have propelled self harm or suicidal tendencies. One of the victims (Lakshmi) might have homicidal past"; অর্থাৎ পারিবারিক সুত্রে মানসিক বিকৃতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যার থেকে অবাস্তব কল্পনা বা দৃশ্য দেখা, আত্মপরিচয়ে গড়মিল ও আত্মহননের ইচ্ছে প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়। মৃতদের একজন (লক্ষ্মী) অতীতে সম্ভবত নরহত্যা করে থাকতে পারে।
বাইরের গম্ভীর শব্দে মেঘ ডেকে উঠল। ঘর এখনও চুপচাপ। অমর চুপচাপ তাকিয়ে আছে পীতাম্বরের দিকে, যিনি আবার হেলান দিয়ে চোখ বুজেছেন।
কোলের নোটবুকে কলমটা গুঁজে ডরোথি একটা লম্বা দম নিল। তারপর বলল, "আপনার বোন দাদামশাইকে মারার আগে "সে আসছে" বলেছিল... আপনার ভাগ্নি নিজেকে শেষ করার

আগে “He is back” লিখে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন... কার আগমনের কথা বার বার বলা হচ্ছে?... কে এ?”
বৃদ্ধ চুপ। একি ভাবে চোখ বন্ধ করে কেদারায় হেলান দিয়ে...
“পীতাম্বরবাবু...” অমর ডাকল।
বৃদ্ধের শরীর আড়ষ্ট... চোখ বন্ধ...
হঠাৎ ঘরের তাপমাত্রা নামতে আরম্ভ করল। কটুগন্ধটাও চতুর্গুণ বেড়ে গেল! দম আটকে এলো ডরোথির! ঝড় উঠেছে বাইরে... কিন্তু তাতে তো ঘরের ভেতরটা হঠাৎ এতটা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার কথা না...!
কিসের শব্দ ওটা? যেন গলার ভেতর থেকে চাপা হাসির রোল উঠেছে... পীতাম্বরবাবু হাসছেন! চোখ তাঁর এখনও বন্ধ। ঘাড় এখনও হেলানো...
“সে যে যুগ যুগ ধরে এই পৃথিবীতে রয়েছে... তার বিনাশ নেই... তার মরণ নেই!”
এ কার গলা! কথাগুলো বেরোচ্ছে পীতাম্বরের মুখ দিয়ে! কিন্তু এ কণ্ঠস্বর তো তাঁর নয়!...

"তোরা কেউ পারবিনা তাকে আটকাতে! সে সাক্ষাৎ মহাপিশাচের রূপ! এই বংশের রক্তেই তার পুনর্জন্ম হয়েছে!"
হঠাৎ হেঁচকি তুলতে আরম্ভ করল পীতাম্বরবাবু! থর থর করে কাঁপতে লাগলো তাঁর সর্বাঙ্গ! চোখ তাঁর এখনও বোজা, ঘাড় এখনও হেলানো!
উঠে দাঁড়াল ডরোথি আর অমর... কি করবে বুঝে ওঠার আগে হেঁচকি তুলতে তুলতে পীতাম্বরবাবুর মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এলো এক রাশ কালচে রক্ত! গলা বেয়ে বুক পেটে ভিজিয়ে দিল রক্তের ধারা! হঠাৎ সামনের দেওয়ালের দিকে তাকাতেই ডরোথির হাত-পা জমে গেল! সেখানে ঝোলানো মা-কালীর পটের মুখটা ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাচ্ছে... তাঁর সেই ছবির কাঁচের ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে পীতাম্বরবাবুর পিঠের প্রতিচ্ছবি... কিন্তু... কিন্তু... তাঁর ঘাড়ে ওটা কে উপুর হয়ে বসে আছে?! মিশমিশে কালো জরাজীর্ণ একটা মূর্তি!... তাকে তো এমনি চোখে দেখা যাচ্ছে না!
থরথরিয়ে কেঁপে উঠল ডরোথি!

পিতাম্বরবাবু কাঁপতে কাঁপতে রক্তবমি করেই চলেছেন। অমর ডরোথির হাতটা ধরে মারল এক হ্যাঁচকা টান।
“চলুন এখান থেকে!”
দুজনে দৌড়ে নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। গোটা বাড়ি ঢেকে গেছে বিকট দুর্গন্ধে! ঝড় উঠেছে। এলোমেলো হাওয়ায় জীর্ণ দরজা জানলাগুলো থরথর করে কাঁপছে! বিরাট চাতালটা পেড়িয়ে হোঁচট খেতে খেতে এই নরকপুরির মূল ফটকের বাইরে এসে দুজনে ঘাসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল!
সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এলো হেড কনস্টেবল আর ড্রাইভার। অমর আর ডরোথিকে গাড়িতে তুলে তারা সাথে সাথে থানায় খবর পাঠালো। তার সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ্যাম্বুলেন্স আনার কথাও জানালো।
পীতাম্বর রায়চৌধুরীকে যখন ধরাধরি করে বাড়ির বাইরে এনে এ্যাম্বুলেন্সে তোলা হোল তখন তাঁর তেমন জ্ঞান নেই। সারা শরীর ভিজে গেছে ওগরানো রক্তে। অমর কাছে গিয়ে

একবার পীতাম্বরবাবুর গলার কাছে হাত রেখে মাথা নাড়তে নাড়তে পিছিয়ে এলো। গ্রামের অনেক মানুষ জটলা করেছিল জমিদারবাড়ির আশেপাশে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ভেতরে গিয়ে পীতাম্বরবাবুকে বইয়ে বাইরে আনার ক্ষেত্রে গ্রামের কেউই তেমন এগিয়ে আসেনি। এ ওকে ঠেলছিল, ও একে ঠেলছিল।
ডরোথি থুম মেরে নিজের গাড়ির বনেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথায় ঘুরছে হাজার চিন্তা। একটু আগে সে যা দেখল তা কি সত্যি? নাকি তার চোখের ভুল? পীতাম্বরবাবু, লক্ষ্মী, তার স্বামী, শিবানী... এরা কি সবাই একি রকম মানসিক বিকৃতির শিকার... নাকি সত্যিই কোনও অপার্থিব অপশক্তি এদের জীবনে একে একে সর্বনাশ ডেকে আনছে?... আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন... কার আগমন ঘটেছে?কে সে যে জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একের পর এক প্রাণ কেড়ে নিয়ে মেটাচ্ছে তার মারণক্ষুধা?
সন্ধে হওয়ার আগে ঘরে ফিরে এলো ডরোথি। সাথে এলো অমর আর হেড কনস্টেবল।

শ্যামাকে সবার জন্য চা করতে বলে তারা সবাই বৈঠকখানায় গোল হয়ে বসল। খানিকক্ষণ কেউ কনোওও কথা বলল না। শুধু দেয়াল-ঘড়িটার টিক টিক শব্দ ছাড়া ঘরে কোনও শব্দ নেই।

"ওই ঘরে আমি যা দেখেছিলাম, তুমিও কি দেখেছিলে অমর?" জানলার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বলল ডরোথি।

"কি দেখেছিলেন ম্যাডাম?"

ডরোথি বুঝল অমর সেই দৃশ্য দেখেনি। সে যদি কলকাতায় ফিরে ডিআইজিকে বলে কোনও অপদেবতা এতোগুলো মানুষের মৃত্যুর কারণ তাহলে হয় তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, নয়ত তাকে ফাঁকিবাজ ভাববে সবাই, ভাববে তদন্ত সম্পন্ন না করতে পেরে গপ্প ফেঁদেছে।

ফোন বেজে উঠল অমরের। চমকে উঠল ডরোথি। অমর ফোনটা রিসিভ করে দু-তিনবার "হু" বলে রেখে দিলো।

"পীতাম্বরবাবু মারা গেছেন ম্যাডাম।"

ডরোথি খানিকক্ষণ অমরের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নামালো। মাথার ওপরে পুরনো পাখাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে ঘুরে চলেছে। ডরোথির মাথায় হঠাৎ একটা অদ্ভুত শয়তানি বুদ্ধি খেলে গেল। ডিআইজিকে সে গিয়ে বলবে পীতাম্বর রায়চৌধুরীদের গোটা পরিবার কোনও বিশেষ কালো-বিদ্যার সাথে জড়িত ছিল। তার সাথে ইন্ধন জুগিয়েছে মানসিক বিকৃতি। এরা সকলেই কোনও তন্ত্র সম্প্রদায়কে মানত আর বিশ্বাস করত শয়তান তাদের ঘরে জন্ম নেবে মানুষ রূপে। তার থেকে ডিলিউশন আর খোওয়াব দেখা। তার থেকে অত্যাধিক ওষুধ সেবন, যার ফলে পীতাম্বরবাবুর মৃত্যু, আর ওই একি কারণে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে শিবানী নিজের মা বাবাকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হয়েছে। ফরেন্সিককে ম্যানেজ করা কোনও ব্যাপারই নয়। আর যেহেতু পরিবারটি এখন সম্পূর্ণ নিঃশেষ, কাজেই ক্রস-কোশ্চেন করার কোনও উপায়ও নেই...

একটা ক্রুর হাসি খেলে গেল ডরোথির ঠোঁটে...

এই দেশে সরকারী স্তরে যত তদন্ত হয়, সবই কি তার গন্তব্যে পৌঁছয়? বেশিরভাগই হয় ধামাচাপা পড়ে, নয় গোঁজামিল দিয়ে ইতি টানা হয়। আর এই মামলার ক্ষেত্রে তো প্রশ্ন তোলারও কেউ নেই। এই পুরো প্ল্যানে বাধ সাধতে পারে কেবল একজন। একজন যে শিবানীকে চিনত। যাকে শিবানী মরার আগে ম্যাসেজ করেছিল।
অনুসূয়া গুপ্ত... রিপোর্ট তৈরি করার আগে একবার তার সাথে কথা বলা দরকার। যদি সে কিছু জানে তাহলে সেই মত এগোনো যাবে, আর না জানলে তো পোয়া বারো!
কেস ফাইল হাতড়ে অমর অনুসূয়া গুপ্তর নরফোকের ফোন নম্বর বের করল। তারপর নিজের ফোন থেকে ডায়াল করে ডরোথিকে ধরাল।
"হ্যালো, নমস্কার অনুসূয়া গুপ্ত কথা বলছেন?"
"————————————"
"আমি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগ থেকে ডরোথি বোস কথা বলছি।"
"———————————"

“আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু কথা দিচ্ছি আপনাকে বিব্রত করবো না।”

“ ____________”

“মিসেস গুপ্ত আপনাকে জানিয়ে রাখি এই মুহূর্তে আপনার বান্ধবী শিবানী সেনের পরিবারের কোন সদস্য জীবিত নেই। একে একে সবাই অজানা কারণে মারা গেছেন। কাজেই ওনার পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র আপনি আছেন যিনি আমাদের পথ দেখাতে পারেন।”

“ ____________”

“বুঝতেই পারছেন বিষয়টা কতটা সিরিয়াস, নাহলে আপনি এত দূরে থাকা সত্ত্বেও আপনাকে বার বার ফোন করছি। একটু যদি কোঅপরেট করেন...

“ ____________”

“সত্যি? আপনি জানেন?”

“_ ____________”

“নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, কখন বলুন?এই যদি দশ মিনিটের মধ্যে আসি?”

“ ”
―――――――――――――
“বেশ, ঠিক দশ মিনিট পর।”
ফোনটা রেখে ডরোথি অমরের হাতে দিয়ে বলল, “ভদ্রমহিলা দশ মিনিটের মধ্যে ভিডিও-কল করছেন তোমার নম্বরেই। উনি শিবানীর ব্যাপারে এমন কিছু জানেন যা আর কেউ জানে না। খাতা কলম নিয়ে রেডি হও, আমি আসছি।”
শ্যামা একপ্রস্ত চা দিয়ে ডরোথির খাবার রেখে রাতের মত ছুটি নিল। ডরোথি গিয়ে চট করে উর্দিটা পরে নিল। ভিডিও-কলএ উর্দি পরিহিতা কাউকে দেখলে ব্যাপারটার গুরুত্ব আর বিশ্বাসযোগ্যতা দুইই বেড়ে যায়।
কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটায় অমরের মোবাইলেই ভিডিও-কল এলো। ডরোথি রিসিভ করতেই পর্দায় ভেসে উঠল এক অচেনা ভদ্রমহিলার ছবি। বয়স আন্দাজ ৬৫। মাথার চুল প্রায় সবই সাদা, চোখে দামি চশমা, মুখে গভীর পাণ্ডিত্যের ছাপ।
ঘরের বাকি দুই ব্যক্তি বসেছে ফোনের পেছনে যাতে অপর প্রান্তের মানুষটা বুঝতে না পারে

ডরোথি ছাড়াও ঘরে আর কেউ আছে।
“নমস্কার, আমিই ডরোথি বোস।”
অনুসূয়াও প্রতিনমস্কার জানাল।
“শিবানী মারা যাওয়ার আগে শেষ মেসেজটা আপনাকে পাঠায়, যাতে লেখা ছিল, “হি ইজ ব্যাক”। এই “হি” ব্যেক্তিটি কে? সেটা জানলেই আমাদের কাজ মিটে যাবে। আমি জানি ডিআইজি সাহেবের দপ্তর থেকে আপনাকে যোগাযোগ করা হয়েছিলো, তখন আপনি বলেছিলেন এই মেসেজটির কোনও ব্যাখ্যা আপনার কাছে নেই। আজ আমি আপনাকে জেরা নয় অনুরোধ করছি। কিছু যদি বলতে পারেন দিদি... অন্তত আপনার মৃত বন্ধুর কথা ভেবে...”
অনুসূয়া খানিকক্ষণ চুপ থাকল। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, “শিবানী কার কথা বলেছে তা আমি সঠিক না জানলেও আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু তার ব্যাপারে জেনে আপনার খুব একটা লাভ হবে না। আমার কথা আপনি বা আপনার ডিপার্টমেন্টএ

কেউই বিশ্বাস করবে না।"
"চারটে মানুষের প্রাণ চলে গেল মিসেস গুপ্ত।" ডরোথি গম্ভীরভাবে বলল। "সরাসরি ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এদের সকলের মৃত্যুর ধাঁধাঁ সেই "হি" এর সাথে জড়িয়ে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আপনি বলুন, আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবো।"
"শুনুন তাহলে," বলতে আরম্ভ করল অনুসূয়া, "শিবানীর ছোটবেলা কেটেছে নিতান্ত অবহেলায়। বাবা ছিল পঙ্গু আর মায়ের ছিল মাথার ব্যামো। মাঝে মাঝে ভায়োলেন্ট হয়ে যেতেন। খুব কম বয়সে পড়াশুনো শেষ করে রূপনারায়ণপুরে এসে কাজে যোগ দেয়। মাসে মাসে টাকা পাঠালেও বাবা-মার সাথে ওর সম্পর্ক ছিল একেবারেই নিরস। আমার সাথে ওর পরিচয় একই মেসে থাকার দরুন। আমায় নিজের বড় দিদির মত ভালবাসত, মনের সব কথা বলত। আমি তখন স্থানীয় গার্লস কলেজে অধ্যাপনা করি। এক সময় বাবা-বার চাপে সে কূলকিনারাহীন একটা ছেলেকে বিয়ে করতে

রাজি হয়। আর এটাই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল...!"
"ভুল কেন?" ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ডরোথি।
অনুসূয়া আবার আশপাশটা দেখে নিল। তারপর বলল, "পুরাণে এমন কিছু জীবের উল্লেখ আছে যারা নশ্বর আর অনশ্বরএর মাঝামাঝি আটকে থাকে। এইসব শক্তিরা মানুষের রূপে রক্তমাংসের পৃথিবীতে বিচরণ করলেও এরা আসলে নরক থেকে উঠে আসা অপদেবতা। এদের আদি নেই, অন্ত নেই। কোনও ধর্মীয় রীতি দিয়ে এদের ক্ষতি করা যায়না..."
ডরোথির বুক টিপটিপ করতে আরম্ভ করেছে। মাথায় ফিরে ফিরে আসছে আজ সকালে দেখা ভয়াবহ দৃশ্যের কথা...
অনুসূয়া বলে চলেছে, "প্রাচীন এক অপদেবতা আজও মানুষের রূপে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে! বছরের পর বছর সে রূপ পরিবর্তন করে একের পর এক পরিবারকে তার শিকার বানিয়ে

চলেছে। তার যখন জীবদ্দশার খিদে মিটে যায় তখন যে নিজের মৃত্যুর ব্যবস্থা নিজে করে ফেলে। তার এক ফোঁটা রক্ত মাটি স্পর্শ করলেই সেখান থেকে হয় সেই পিশাচের নবজন্ম। তারপর আবার এক হতভাগ্য পরিবারের শিকার... একি রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি। প্রত্যেকবার শিকারের শেষে রক্তাক্ত আত্মাহুতি... তারপর আবার মাটির গভীরে পৈশাচিক প্রাণের সঞ্চার!”

“কি নাম এই অপদেবতার?”

“অনুসূয়া খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সামনের ক্যামেরার দিকে...

“রক্তবীজ!”

নামটা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে যেন ঘরে একটা হাওয়ার দমকা লাগলো। অমর উঠে হালকা করে দক্ষিণদিকের জানলাটা ভেজিয়ে দিল।

“শিবানীর স্বামী মানুষ ছিল না। সে ছিল নরকের পাপের ফসল। রক্তবীজ। শিবানীর মধ্যে সে এই পৈশাচিক বীজ বপন করে

ভেবেছিল নিজের বংশ বিস্তার করবে। কিন্তু তার এই চেষ্টা সফল হয়নি। সে যখন নিজের গলায় আঘাত করে নিজের রক্তে মাটি ভেজাতে চেয়েছিল, শিবানী তার স্বামীর গলা থেকে বেড়িয়ে আসা সবটুকু রক্ত গিলে নিজের মধ্যে নিয়ে নিয়েছিল। তারপর নিজের গর্ভে বেড়ে ওঠা রক্তবীজের সন্তানকে জন্মাবার আগেই মেরে ফেলেছিল।"

ঘরে দমবন্ধ করা নিস্তব্ধতা...

হাত-পা কাঁপতে আরম্ভ করেছে ডরোথির। এ কোন ভয়াল জগতের সাথে জড়িয়ে পড়েছে সে? এমন এক জগত যেখানে রক্তমাংসের মানুষের নিয়ম খাটে না... কোনও প্রার্থনা, আকুতি, শুদ্ধাচারের কোনও প্রভাব নেই... শুধ অন্ধকার, ত্রাস আর মৃত্যুর হাতছানি...

"শিবানীর নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল এই অপদেবতা আবার নতুন রূপে ফিরে এসেছে। সেই তার বাবা-মাকে মেরেছে। তার আগমনের আভাষ পেয়েই সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে!"

“কিন্তু কিভাবে? যদি তার স্বামীর এক ফোঁটা রক্তও মাটি না ছুঁয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে ফিরতে পারে সে?” বলে উঠল ডরোথি।

“যদি সত্যিই সে ফিরে এসে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে কোনও না কোনও ভাবে সেই রক্ত মাটিতে পড়েছিল...”

চুপ করে গেল ডরোথি। এও কি সম্ভব?এক যুক্তিতর্কহীন প্রাণী যে না মানুষ, না অমানুষ, সে এতোগুলো মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী?একজন আইপিএস অফিসার হয়ে তাকে এই কথা মানতে হবে?কিন্তু... কিন্তু আজ সকালে সে নিজের চোখে যা দেখল, তাই বা অস্বীকার করে কিভাবে? পীতাম্বরের মৃত্যু... কি ব্যাখ্যা আছে তার? যদি সত্যিই অঘোর ভৈরবের অভিশাপ ফলে থাকে, তাহলে প্রথমে গঙ্গাধরের নাতি পীতাম্বর এই অভিশাপের বাহক হয়েছিল, তারপর নাতনী লক্ষ্মী... সব শেষে লক্ষ্মীর মেয়ে শিবানী... যার গর্ভে রক্তবীজের আগমন হয়েছিল... যদি সেই ভ্রূণ থেকেই এই শয়তানের পুনর্জন্ম হয়ে থাকে তাহলে... তাহলে তো সত্যিই

গঙ্গাধরের বংশে শয়তান মানুষরূপে জন্মেছে!

“আচ্ছা, আপনার কাছে শিবানীর স্বামীর কোনও ছবি আছে?”

“শিবানীর বিয়েতে তোলা দু-একটা ছবি থাকতে পারে। দাঁড়ান।...”

অনুসূয়া উঠে গেল, ফিরে এলো মিনিট দুয়েকের মধ্যে। তারপর একটা অনেক পুরনো ছবি মেলে ধরল ক্যামেরার সামনে।

“ঠিক দেখতে পাচ্ছিনা। আরেকটু সামনে আনুন,” চোখ কুঁচকে বলল ডরোথি।

অনুসূয়া সামনে আনল ছবিটা। পাশাপাশি দাঁড়ানো চার পাঁচজন মহিলা, তাদের মধ্যে একজন অনুসূয়া নিজে। কনের বেশে শিবানী আর বরের পোশাকে যে-

হঠাৎ ডরোথির বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল আতঙ্কে! গায়ে পাঞ্জাবী, গলায় মালা দিয়ে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের ছবিতে যাকে দেখা যাচ্ছে সে মুখটা যে ডরোথির খুব চেনা!

হঠাৎ পৃথিবী কাঁপিয়ে বাজ পড়ল। সেই আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল ডরোথির।

সাথে সাথে ঘরের বাতি নিভে গেল, ধাক্কা খেয়ে ফোনটা টেবিল থেকে পড়ে ঘর মিশকালো অন্ধকারে ঢেকে গেল।
ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর হঠাৎ একটা ধস্তাধস্তির শব্দ। কিসের একটা ধাক্কায় ডরোথি ছিটকে পড়ল ঘরের কোণায়! একটু আলো... একটু আলো... পকেট হাতড়ে নিজের ফোনটা পেল না।। নিশ্চয়ই সেটা টেবিলের ওপর রয়ে গেছে। ঘরের ভেতর হঠাৎ সেই দম বন্ধ করে দেওয়া গন্ধ! তারপর হঠাৎ একটা রক্ত জল করে দেওয়া হাড় ভাঙার শব্দ! একটা অস্ফুট ককিয়ে ওঠার আওয়াজ। তারপর সব চুপচাপ...
নিস্তব্ধ...
"অমর..."
নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের ভেতর কোনও উত্তর ফিরে এলো না ডরোথির ডাকের...
হাতড়ে হাতড়ে ডরোথি অমরের ফোনটা কুড়িয়ে পেল। জ্বালিয়ে দিল আলো। টিমটিমে আলোয় যা দেখল তাতে ডরোথির দম আটকে এলো!

ঘরের মাঝখানের টেবিলটার ওপর পড়ে রয়েছে ইন্সপেক্টর অমর মজুমদার। নিথর! তাঁর মুণ্ডুটা হিঁচড়ে মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পেছন দিকে। গলার নলিগুলো প্রায় উপড়ে এসেছে ঘাড়ের ওপর দিয়ে।

চিৎকার করে উঠল ডরোথি!

তার হাতের আলোটা সরেছে ঘরের ওপর প্রান্তে। মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে আছে একটা জীব। গায়ে খাকি উর্দি। যার মুখের সাথে প্রায় হুবহু মিল একটু আগে ছবিতে দেখা শিবানীর স্বামীর! এখন আর তার মুখ স্বাভাবিক নেই। তার চোখদুটো টকটকে লাল! মুখের, গলার শিরা-উপশিরাগুলো দগদগে হয়ে ফুলে উঠেছে! কি বলবে তাকে? মৃত্যুঞ্জয় নস্কর? নাকি... রক্তবীজ!

আর্তনাদ করে উঠলো ডরোথি... ছিটকে দেওয়ালে গিয়ে পিঠ ঠেকে গেল তার। হাতে ধরা কম্পমান মোবাইলের আলো। সেই স্তিমিত আলোয় ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এলো রক্তবীজ!

"ভেবেছিল পেটেই আমার কবর বানিয়ে দেবে শিবানী... কিন্তু আমার যে কবর থেকেই জন্ম!" বিকট শব্দে হেসে উঠল অপদেবতা!
"এই মল্লারপুরের মাটিতেই অঘোরকে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। এই মাটিতেই মিশে রয়েছে অঘোরের অভিশাপ।এই মাটিতেই আবার হবে আমার পুনর্জন্ম!"
দপদপ করছে রক্তবীজের মুখময় জেগে ওঠা দগদগে শীরাগুলো।
"শিবানীর সাথে পুরনো হিসেব বাকি ছিল, তাই ওর বাপ মা কে মুক্তি দিলাম। পীতাম্বরের আত্মা অনেক আগেই শূন্য হয়ে গেছিল, শুধু জ্যান্ত লাশ হয়ে পড়ে ছিল। বাকি শুধু রইলি তুই যে আমার ব্যাপারে জেনে গেছিস..."
পিশাচটার মুখ ডরোথির মুখের একদম কাছে। দুর্গন্ধে দম আটকে আসছে ডরোথির।
"এবার তোর পালা" সাপের মত হিসহিস করে বলল রক্তবীজ।
হঠাৎ ডরোথির হাতে ঠেকল দরজার খিলটা। ঘুরিয়ে সপাটে চালাল পিশাচটার মুখ লক্ষ্য

করে। লাগল না। কিন্তু তার ঝটকায় দু পা পিছিয়ে পিছলে গেল মৃত্যুঞ্জয়।
ডরোথি অন্ধকারের মধ্যেই দরজার হাতলটা ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বাইরে এসে পড়ল। তারপর দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়োতে থাকল। আকাশের কোণায় কোণায় বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে। তারই আলোয় ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে দৌড়োতে লাগল ডরোথি। কিছুদুর গিয়ে তার ধাঁধাঁ লাগল... ডোবাটা কোথায় গেল? এতক্ষণে তো থানার পেছনের গেটে এসে যাওয়ার কথা! হঠাৎ তার খেয়াল হল সে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেড়িয়ে দৌড়েছে অর্থাৎ থানার উল্টোদিকে এসে পড়েছে! চারদিকে থমথমে অন্ধকার। ডরোথি দম নিতে নিতে তাকিয়ে দেখল চার চারদিকে গাছের দেওয়াল। সে মল্লারপুরের পশ্চিম প্রান্তের শালবনের মধ্যে এসে পড়েছে। আজ যেন ঝিঁঝিঁ পোকাগুলোও সব বোবা হয়ে গেছে। গোটা জঙ্গলটা যেন এক নারকীয় নিস্তব্ধতার চাদরে মুখ ঢেকেছে।

দূরে ওটা কি?একটা বাড়ি না? কিন্তু তাতে তো কোনও আলো জ্বলছে না। শুকনো পাতার ওপর পা ফেলে ফেলে ডরোথি এগিয়ে গেল সেদিকে। ঝোপে ঘেরা ভগ্নপ্রায় একটা দোতলা বাড়ি। অন্ধকার থমথমে... তার বাইরে শ্যাওলা ধরা দুটো মূর্তি। বহুকালের অবহেলায় প্রায় চেনা যায় না। একটা মূর্তি নিঃসন্দেহে গঙ্গাধর রায়চৌধুরীর... অন্যটা কে? তাঁর মেয়ে কি? তাই হবে। এই মেয়ের স্মৃতিতেই হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল বহুকাল আগে... এখন তা ধ্বংসস্তূপ... ফাটল ধরা পাঁচিলের গায়ে ওগুলো কি? জং ধরা কয়েকটা টিনের বোর্ড... তাতে লেখাগুলো আবছা আর অস্পষ্ট। এই বোর্ডগুলো সে আগেও দেখেছে! এই জায়গায় সে আগেও এসেছে! কি হচ্ছে এটা! এ কোন বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের বেড়াজালে আটকে সময় তাকে নিয়ে খেলা করছে!

“না না না... মুক্তি দাও আমায়!” চিৎকার করে মাথা ধরে বসে পড়ল ডরোথি।

দমকা হাওয়া উঠল। ধুলোয় ঢেকে গেল

চারিদিক। হঠাৎ হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে একটা শব্দ ডরোথির কানে এলো। শুকনো পাতার ওপর পায়ের শব্দ। কেউ তার পেছনে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। ঘুরে যায় ডরোথি! কেউ কোথাও নেই। এই ভয়াল লুকোচুরি সে আগে দেখেছে... কি ভাবে পালাবে সে? কে বাঁচাবে তাকে?
আবার ছুটতে শুরু করল ডরোথি। আতঙ্কে যেন বুক দিয়ে শ্বাস ঢুকছে না। পড়ে থাকা একটা গাছের ডালে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল ডরোথি।
দূরে গাছের তলায় অন্ধকারে দেখা গেল তাকে... মৃত্যুঞ্জয়! হাতড়ে হাতড়ে উঠে বসল ডরোথি। নাক ফেটে উর্দির বুকের ওপর গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা।
মৃত্যুঞ্জয় সেই একিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার ছায়ার ভেতর তার চোখদুটো যেন ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে। কোমরে ঠাণ্ডা মতন কি ঠেকছে ডরোথির। আরে! এটার কথা এতক্ষণ মনে হয়নি কেন? তার সার্ভিস রিভলভার! এক

টানে রিভলভারটা বের করে আনল ডরোথি। তারপর তুলে ধরল অপদেবতাটার দিকে। এতদিনের চাকরি জীবনে এই কাজটা কখনও করেনি সে। কখনও কাউকে শ্যুট করতে হয়নি তাকে।
অন্ধকার থেকে মৃত্যুঞ্জয় এবার এগোতে থাকল তার দিকে। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে প্রায় ভেসে ভেসে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ডরোথির। না, এই ভুলটা সে দ্বিতীয়বার করবে না। কিছুতেই রক্তবীজের রক্তে মাটি ভিজতে দেবে না! ট্রিগারে রাখা আঙুল কাঁপতে লাগল তার... মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল ডরোথির ওপরে!

***

চোখ খুলল ডরোথি...
চারিদিক ঝাপসা লাগছে! গায়ে যেন তেমন সার নেই। তার নাকের তলায় কি? অক্সিজেনের নল? সে নিশ্চয়ই হাসপাতালে... কে নিয়ে এলো তাকে? মাথার পাশে একটা মনিটরে অনেক

সংখ্যা বাড়ছে কমছে... একটা সে চিনতে পারল... তার হার্টবিট...80... 84... 76... এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে...
বেডের পাশে এক অচেনা মুখ, "যাক, এই যাত্রায় বেঁচে গেলেন। আপনার ফ্যামিলিকে খবর দেওয়া হয়েছে যে আপনার জ্ঞান ফিরেছে।"
কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ডরোথির। তবু চিঁ চিঁ করে বলল, "আমি কতদিন এখানে আছি?"
"তা প্রায় আট- সাড়ে আট মাস।"
ধড়াস করে উঠল ডরোথির বুক। সাড়ে আট মাস! এতদিন সে হাসপাতালে-
"মাথায় দশ মনের একটা গাছের ডাল পড়েছিল। তাও ভাগ্যিস একদিকে ঘা খেয়েছিলেন বলে আট মাসে কোমা থেকে বেরোলেন। পেছন দিকে লাগলে আর উঠতেনই না। আপনার চিন্তা নেই। আপনি লাইন অফ ডিউটিতে ঘায়েল হয়েছেন- সব খরচা সরকারের।" হেসে বলল ডাক্তার।
আট মাস সে কোমায় ছিল! অথচ, তার যে মনে

হচ্ছিল এই একটু আগে-
সে কি তবে স্বপ্ন দেখছিল? ডিআইজির সাথে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে জঙ্গলের ঘটনাটা সবই কি তার কল্পনা?
পেটের তলার দিকটায় যেন একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা... মাথার মধ্যে সব তালগোল পেকে যাচ্ছে...
“ডাক্তারবাবু, আমায় কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?” কোনরকমে দম টেনে জিজ্ঞেস করল ডরোথি।
“জায়গাটা আমি সঠিক জানি না তবে শুনেছিলাম যেন আপনি তদন্তের কাজে বীরভূমের কোথাও গিয়েছিলেন।”
হাত পা অবশ হয়ে এলো ডরোথির। তার মানে... তার মানে... হঠাৎ বাজ পড়ার মত একটা কথা মনে পড়ে গেল তার! ঘাড় ঘুরিয়ে মাথার ওপরের মনিটরটা দেখল...
৭৪...৪০...৪২
তার চোখে এখন চশমা নেই। খালি চোখেই একটু ঝাপসা হলেও সে পড়তে পারছে।

সেদিনও পেরেছিল। "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে" হ্যাঁ মনে পড়েছে। সে ঠিক পড়তে পেরেছিল। যেদিন সে নিজের রিভলভার দিয়ে রক্তবীজকে গুলি করে তার রক্ত মাখা মাটি খেয়েছিল, সেদিন তার পড়তে অসুবিধে হয়নি। অথচ দ্বিতীয়বার যখন জঙ্গলে গিয়েছিল তখনও টিনের বোর্ডগুলো সে দেখেছিল কিন্তু একটা অক্ষরও পড়তে পারেনি। গঙ্গাধরের মূর্তির নিচের পাথরের ফলকও পড়তে পারেনি! এমনকি ডিআইজির সামনে বসে শিবানীর সুইসাইড নোটও পড়তে পারেনি। কেমন করে পারবে... সে যে পুরটাই অচৈতন্য হয়ে স্বপ্ন দেখছিল! আর ডরোথি ভালই জানে যে স্বপ্ন মানুষ ব্রেনের বাঁদিক দিয়ে দেখে তাই স্বপ্নে কোনও কিছু পড়া যায়না, কারণ অক্ষর চেনা ব্রেনের ডানদিকের কাজ!

দম আটকে এলো ডরোথির! পেটের ব্যাথাটা অসহ্য বাড়ছে!

"একি! অমন করছেন কেন? কষ্ট হচ্ছে? সিস্টার! সিস্টার!" চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তারবাবু!

এই সমস্ত কিছু ঘটেছে, কিন্তু তার কোমায় যাওয়ার আগে। মনে পড়তে লাগলো ডরোথির। সে তদন্তের ভার নিয়ে মল্লারপুরে গিয়েছিল। পীতাম্বরকে মরতেও দেখেছিল... তারপর মৃত্যুঞ্জয়....! জঙ্গলে সেদিন সে রক্তবীজকে সত্যিই গুলি করে মেরেছিল! তার কোমায় যাওয়া মাথা তাঁকে পুরো ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখিয়েছে এই হাসপাতালের বেডে অচৈতন্য অবস্থায়...

ককিয়ে উঠল ডরোথি। পেটের ব্যাথাটা যেন ছিঁড়ে খাচ্ছে তাকে! তলপেটটা ধরে চিৎকার করে উঠল ডরোথি।

"আপনার প্রেগন্যান্সি কতদিন হোল?"

প্রেগন্যান্সি! এ কি বলছে ডাক্তার? সে তো কখনও কিছু... ডরোথির চোখ তার পেটের দিকে গেল! ভয়ে তার হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে চলে এলো!

কানের কাছে বেজে উঠল রক্ত জল করে দেওয়া নারকীয় আস্ফালনের উক্তি...

"ভেবেছিল পেটেই আমার কবর বানিয়ে দেবে

শিবানী... কিন্তু আমার যে কবর থেকেই জন্ম!"
রক্ত আর ভূমি দুইই গেছে ডরোথির পেটে!
ডাক্তার ছিটকে সরে এলেন বেডের কাছ থেকে। বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তিনি দেখলেন প্রথমে ডরোথির শরীরটা হঠাৎ ধনুকের মত বেঁকে মুচড়ে গেল। ঘাড়টা ঝুলে পড়ল পেছনদিকে। এলো চুল এলিয়ে পড়ল বেডের পাশ দিয়ে। প্রথমে তার চোখদুটো ঠিকরে বেড়িয়ে আসতে চাইল। সে মুখ খুলল কিন্তু আওয়াজ বেরোল না।বীভৎস সেই অভিব্যক্তি! যেন জগতের সব যন্ত্রণা তার শরীরের ভেতর থেকে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিংড়ে নিচ্ছে! জিভটা কাঁপতে কাঁপতে বেড়িয়ে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। গলার শিরাগুলো ফুলে উঠল আর সেই সাথে চোখ দুটো উলটে গেল মাথার পেছন দিকে! ডাক্তার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন মেঝের ওপর। তারপর উনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডরোথির পেটের মাংস ফুঁড়ে নাড়িভুঁড়ি ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর! রক্তে ভেসে গেল বিছানার চাদর, সাদা মেঝে। ডরোথির পেটের গহ্বর

থেকে উথলে ওঠা মাংসপিণ্ডের ভেতর থেকে বেরোল ছোট্ট একটা হাত। রক্ত মাখা...।
তারপর হাতে ভর দিয়ে বেরোল রক্তে স্নান করে যাওয়া একটা ছোট্ট মাথা। তারপর পিছলে পিছলে বেরোল তার পুরো শরীর! যেন নরকের অভিশপ্ত মৃত্যুকূপ থেকে হল নতুন প্রাণের সঞ্চার।
মেঝেতে পড়ে থাকা ডাক্তার প্রায় মূর্ছিত। ঘরের মেঝে ভেসে যাচ্ছে রক্তে। শুধু ডরোথির চিরে যাওয়া পেটের ভেতর নড়াচড়া করছে রক্তমাখা একটা সদ্যোজাত শরীর। একা একাই হিক্কা তুলে যাচ্ছে সে।
এরপর হয়ত পুলিশ আসবে, ডরোথির পরিবার আসবে, কান্নাকাটি হবে, তদন্ত হবে... কিন্তু এই দেশে কটা তদন্ত তার গন্তব্যে পৌঁছয়? বেশিরভাগই হয় ধামাচাপা পড়ে, নয় গোঁজামিল দিয়ে ইতি টানা হয়। এটাও হয়ত তাইই হবে... হতে বাধ্য। এই শিশুর এই বীভৎস জন্ম নিয়ে হয়তো অনেক আলোচনা হবে, তার গর্ভাবস্থায় কোনও কমপ্লিকেশন ছিল কিনা সেই নিয়ে

হয়ত তর্ক হবে। কেউ বিশ্বাস করবে, কেউ করবে না। কেউ দোষ দেবে ডাক্তারকে, কেউ আঙুল তুলবে ডরোথির চরিত্রের দিকে। কিন্তু যেটা অবশ্যম্ভাবী তা হল এই শিশুটিকে কেউ না কেউ ঘরে নিয়ে যাবে। বুকে টেনে নিয়ে নিজের সন্তান রূপে মানুষ করবে। নিজেদের অজান্তেই স্নেহ, মায়া মমতা দিয়ে বড় করে তুলবে অমানুষ রক্তজাতক রক্তবীজকে!

সমাপ্ত